# "শরীরং আদ্যম, খলু ধর্মসাধনম"

স্বাস্থ্যই ধর্ম - সুস্থ সবল দেহেই মানুষ ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হতে পারে। ধর্ম অর্থে কেবলমাত্র ঈশ্বরচিন্তাই বুঝায় না। লৌকিক, পারলৌকিক উত্তয়ক্ষেত্রেই সুস্থ ও সবল দেহের প্রয়োজন। সুস্থ দেহই সবল মনের আশ্রয় - এই সবল মনই মানুষকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

নীরোগ, নিরাময় দেহ আদিম যুগ হতেই মানুষের কাম্য। তাই একদিন ধ্বনি উঠেছিল- "চাই স্বাস্থ্য, চাই বীর্য, চাই শক্তি।" স্বাস্থ্যই শক্তির আধার - এই শক্তি বলেই জাতি হয় বীর্য্যবান, প্রতিষ্ঠিত করে আপন অধিকার।

প্রাণীর সৃষ্টি যেদিন থেকে, রোগের সৃষ্টিও সেদিন থেকেই। রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষই হয়েছে জয়ী - আজও সে এগিয়ে চলেছে নির্ভয়ে। প্রকৃতিদত্ত রোগকে সে কোনদিনই তুচ্ছ জ্ঞান করেনি - প্রকৃতিদত্ত প্রতিকার ব্যবস্থার দ্বারাই সে রোগ-ব্যাধিকে পরাস্ত করেছে; তার আক্রমণকে প্রতিহত করেছে।

গুহাবাসী মানবও একদিন প্রকৃতিদত্ত উপকরণের সাহায্যে রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে - ভেষজ গাছ-গাছড়া ব্যবহার দ্বারাই সে সুস্থ ও নীরোগ থাকার চেষ্টা করেছে। রোগের উৎপত্তি বা তা নিরসনের সঠিক কারণ না জানলেও রোগব্যাধির কাছে সে কোনদিনই মাথানত করেনি; সংগ্রাম করেই আজও সে বেঁচে আছে।

অগ্রগতির পথে ক্রমে ক্রমে মানুষ বিচারবুদ্ধি দ্বারা রোগনিরাময়ে বিভিন্ন ভেষজের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও উহার প্রয়োগ নিরুপণ করিতে আরম্ভ করে - সৃষ্টি হয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা। লক্ষ্য হলো - প্রকৃতিতেই আছে রোগ নিরাময় ব্যবস্থা।

প্রাচীনকালে মুণিঋষি-গণ অরণ্যে, গুহায় ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকতেন। দেহ সুস্থ ও সবল রাখার জন্যে তাই তাঁরা বিভিন্ন ভেষজ গাছ-গাছড়ারও সন্ধান রাখতেন। তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাপ্রণালী। প্রাচীনকালে, মধ্যযুগে এমনকি দু'শো বছর আগেও ( পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলনের পূর্বে ) আয়ুর্বেদই ছিল রোগের একমাত্র প্রতিকার। আয়ুর্বেদই আবিষ্কার করে "সর্বরোগহর" ঔষধ - আয়ুর্বেদই আবিষ্কার করে "মৃতসঞ্জীবনী।"

আয়ুর্বেদের মূলে পৌরাণিক কাহিনী যাহাই থাকুক না কেন, জ্ঞানতপস্বীরা যুগে যুগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারাই আয়ুর্বেদকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সুক্ষদৃষ্টিসম্পন্ন চিকিৎসকগণ আয়ুর্বেদের মূলসূত্র অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন - আয়ুর্বেদকেও সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

"শরীরম্ ব্যাধি মন্দিরম" - এই আপ্তবাক্যকে ভিত্তি করেই আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র। শরীরকে ব্যাধিমুক্ত করাই এই চিকিৎসার মূলসুত্র। শরীরকে ব্যাধিমুক্ত করেই আয়ুর্বেদ একদিন শাস্ত্রের আসন গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদের চর্চাও যেমন ছিল, প্রচলনও ছিল সর্বত্র। আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিধি ও রোগনিরাময় পদ্ধতি দিকে দিকে প্রসারিত হয়েছিল। প্রাচীনকালে শাসকবর্গও আয়ুর্বেদকেই একমাত্র চিকিৎসাপ্রণালী বলে স্বীকার করেছিলেন - তখন ছিল আয়ুর্বেদের স্বর্ণযুগ। চিকিৎসা অর্থে তখন আয়ুর্বেদকেই বোঝাত।

তারপর এল আয়ুর্ব্বেদের অন্ধকার যুগ। ভারতে বৈদেশিক আক্রমণের, বিশেষ করে মুসলমান ও পররর্তী যুগে ইংরেজ আক্রমণের পর থেকে আয়ুর্ব্বেদ ধীরে ধীরে অন্ধকারে বিলীন হয়ে য়েতে লাগল। বহু প্রাচীন পুঁথিপত্র বিনষ্ট হলো - এবং এই চিকিৎসা চর্চাও ক্রমে হ্রাস পেতে লাগল। ইংরেজ শাসনাধীনে পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থা ( অ্যালোপ্যাথি ) প্রচলনের ফলে আয়ুর্বেদের ওপর এল প্রচণ্ড আঘাত। শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় এই চিকিৎসার চর্চা ও প্রয়োগ ক্রমশ বিস্মৃতির পথে চলে যেতে লাগল। আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণ প্রমাদ গণলেন । কিছু তাঁরা ছিলেন নিরুপায় । প্রবল প্রতাপান্বিত রাজসরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে লাগলেন। কিন্তু পরাজিত হলেও তাঁরা একেবারে নিরাশ হলেন না। কতিপয় কীর্তিমান মনীষী

তখনও আয়ুর্বেদকে স্বীয়পদে পুনরোধিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করতে লাগলেন। এঁদেরই একজন হলেন মহাপ্রাণ কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়।

যে চিকিৎসায় "কস্তুরী-মৃগনাভি" প্রয়োগে মৃতকল্প রোগীকে পুনর্জীবন দানের ব্যবস্থা আছে সে চিকিৎসাপদ্ধতি যে নিষ্ফল বা ব্যর্থ নয় তা প্রমাণ করার জন্যই যেন যামিনী ভূষণের আবির্ভাব। বীরপ্রসবিনী ভারতমাতা "বীর" সন্তানের অভাববোধ কোনোদিনই করেননি। ক্ষীয়মান আয়ুর্বেদকে পুনর্জীবনদানের জন্যই এগিয়ে এলেন যামিনীভূষণ। অদম্য উৎসাহ ও অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যামিনীভূষণ নামলেন কর্মক্ষেত্রে। পদে পদে শতসহস্র বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চললেন স্বীয় লক্ষ্যপথে - লক্ষ্য আয়ুর্বেদের মহিমা পুনঃপ্রচার।

ঐকান্তিক নিষ্ঠা বিফলে যায় না। যে মহীরুহের বীজ তিনি বপন করে গিয়েছেন আজ তা সত্যই বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। উহারই সুশীতল ছায়াতলে আজ শত শত মৃত্যুপথযাত্রী আশ্রয় ও বিশ্রাম নিতেছে। "আমরা বাঁচবো, আমরা চলবো" - এই তাদের আশা, এই তাদের চোখের ভাষা। আশাই তাদের ভরসা - যামিনীভূষনের স্বপ্নও আজ সার্থকতার পথে।

বাংলার গৌরবোজ্জল যুগ ঊনবিংশ শতকের শেষ অঙ্কে যামিনীভূষণের জন্ম (১লা জুলাই, ১৮৭৯)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে এম-এ পাশ করে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম-বি পাশ করেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করলেও যামিনীভূষণ আয়ুর্বেদকে পুনরুদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ করেন এবং এই চিকিৎসাপদ্ধতির প্রচারকেই জীবনের ব্রত বলে প্রহণ করেন। পিতা কবিরাজ পঞ্চানন কবিচূড়ামণি ও কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেনের নিকট তিনি আয়ুর্বেদ শিক্ষালাভ করেন।

দুঢ়প্রতিজ্ঞ যামিনীভূষণ তখন অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ুর্বেদকেই আঁকড়ে ধরেন। ভারতের গরিব দেশবাসীর পক্ষে স্বল্পব্যয়ে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাই শ্রেয় এবং কাম্য এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। আয়ুর্বেদ শিক্ষা প্রচারের জন্য একটি আয়ুর্বেদ কলেজ ও গরিব দেশবাসীর সুষ্ঠু চিকিৎসা ব্যবস্থাদির জন্য

একটি আয়ুর্বেদ হাসপাতাল স্থাপনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। গুরু বিজয়রত্ন সেনেরও ছিল এই বাসনা। কৃতী শিষ্য যামিনীভূয়ণ এই সংকল্প ও ব্রতই গ্রহণ করেন এবং অক্লান্ত চেষ্টায় উহাকে রূপদান করেন।

১৯১৬ সালে ফড়িয়াপুকুরে এক ভাড়াটে বাড়িতে যামিনীভূষণ একটি আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করেন - ইহাই হল 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়' মূল ভিত্তি। আয়ুর্বেদের আটটি বিভিন্ন 'অঙ্গ' শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থেকেই এর নাম হয় 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়' ।একদল একনিষ্ঠ নিরলস কর্মী হল যামিনীভূষণের সম্পদ ও সাথী - সকলেরই লক্ষ্য এক - আয়ুর্বেদ চিকিৎসার পুনরুদ্ধার।

এঁদের মধ্যে হলেন স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ বসু, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, ডাঃ বটকৃষ্ণ রায়, ডাঃ অমিয় মাধব মল্লিক, ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ, ডাঃ শিবচন্দ্র মল্লিক, কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন, কবিরাজ বিশ্বেশ্বর প্রসন্ন সেন, কবিরাজ করুণা কুমার সেন, কবিরাজ কালিভূষণ সেন, কবিরাজ সত্যচরণ সেন প্রভৃতি।

ওই বৎসরই ১লা বৈশাখ মাত্র ১২টি ছাত্র নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হল - যামিনীভূষণ হলেন প্রথম অধ্যক্ষ এবং কবিরাজ বির্জাচরণ গুপ্ত সহ-অধ্যক্ষ ও কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ কুমার দাশ হলেন অধ্যাপক। ছাত্রদের বিনাব্যয়ে শিক্ষা ও খাওয়া থাকার ব্যবস্থা হল। এই সময়ে যামিনীভূষণ "আয়ুর্বেদ" নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন - উদ্দেশ্য আয়ুর্বেদের প্রচার ও প্রসার এবং আয়ুর্বেদ শিক্ষাদান।

বিদ্যালয়ের সুনাম দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল । বোম্বাই, মাদ্রাজ, নেপাল এমনকি সুদূর সিংহল থেকেও ছাত্র আসতে লাগল এখানে অধ্যয়ন করতে। বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি বহির্বিভাগ ডিসপেনসারি-ও অচিরে খোলা হল। ডিসপেনসারি অতি অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় সেবা প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত হয়ে উঠলো এবং দৈনিক প্রায় ১০০ রোগী চিকিৎসার জন্য এখানে আসতে লাগল।

বিদ্যালয় ও ডিসপেনসারি পরিচালনার বিরাট ব্যয় যামিনীভূষণ হাসিমুখে বহন করতে লাগলেন। নিষ্ঠার জয়, সত্যের জয় - এই ছিল তাঁর অবিচল বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস-ই জুগিয়েছে তাঁর কর্ম শক্তি। তাঁর প্রচেষ্টায় তখন বাইরের দানও কিন্তু কিছু আসতে লাগল। অদম্য উৎসাহে যামিনীভূষণ এগিয়ে চললেন।

চলার পথে প্রতিবন্ধক আছেই । যামিনীভূষণও পেলেন প্রচণ্ড বাধা। কবিরাজ বির্জাচরণের আকস্মিক মৃত্যুতে যামিনীভূষণ নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করলেন। এই গুরুদায়িত্বভার একা কিভাবে বহন করবেন এই হল তাঁর প্রধান চিন্তা। এই বিরাট আঘাতেও তিনি নিরুৎসাহ হলেন না। বিদ্যালয়টি তখন তিনি একটি জনপ্রতিষ্ঠনরূপে রেজিস্ট্রি করান এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হলেন ট্রাস্ট বোর্ডের প্রথম সভাপতি এবং মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন কাউন্সিলের সভাপতি। বিদ্যালয় ও ডিসপেনসারি পরিচালনাভার দেওয়া হল নবগঠিত কার্যনির্বাহক সমিতির উপর।

ফড়িয়াপুকুরের বাড়ীতে স্বল্পপরিসর স্থানে বিদ্যালয় ও ডিস্পেন্সারির স্থান সংকুলান না হওয়ায় যামিনীভূষণ শ্যামবাজার ব্রীজ রোডে ( বর্তমান আর জি কর রোড ) সুপরিসর গৃহে উহা স্থানান্তরিত করেন। সেটা হল ১৯২১ সন।

যামিনীভূষণের মনে তখন একটি আয়ুর্বেদ হাসপাতাল স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু হাসপাতালের

জন্য চাই আরও বড় জায়গা, আরও বড় বাড়ী - চাই নিজস্ব বাড়ী, চাই অর্থ। সংকল্পে অটল যামিনীভূষণের দিবাবাত্রির চিন্তা তখন "হাসপাতাল"।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদর্শী" - হাসপাতালের জন্য স্থান সংগ্রহ হল। কলিকাতা কর্পোরেশনের তদানীন্তন চেয়ারম্যান শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও তাঁহার পরবর্তী চেয়ারম্যান ডাঃ হরিধন দত্ত মহাশয়ের প্রচেষ্টায় যামিনীভূষণ ১৭০নং রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে ১ বিঘা ১৪ কাঠা জমি সংগ্রহ

করতে সক্ষম হন। নামমাত্র খাজনায় ৯৯ বৎসরের লিজে এই জমি পাওয়া যায় - ইহাই বর্তমান অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও হাসপাতাল। ১৯২৫ সনে ৬ই মে মহাত্মা গান্ধী বিদ্যালয় ও হাসপাতাল ভবনের ভিত্তি স্থাপন করলেন। তদবধি এতদঞ্চলে হাসপাতালটি "গান্ধী হাসপাতাল" নামেই পরিচিত।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল - এখন যামিনীভূষণের একমাত্র সাধনা বিদ্যালয় ও হাসপাতালের উপযোগী গৃহ নির্মাণ। স্বপ্ন সফল করার জন্য তিনি প্রাণপাত চেষ্টা করতে লাগলেন - অদম্য উৎসাহে অর্থসংগ্রহে ব্রতী হলেন। নিজের সঞ্চিত অর্থদান করলেন অকাতরে - বাইরের দানও আসতে লাগল। এই সময় যামিনীভূষণ সহকর্মীরূপে পেলেন পরম সুহৃদ মনমোহন পাঁড়েকে। তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতায় যামিনীভূষণ আরব্ধকর্মে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলেন।

কিন্তু বিধির বিধান মানুষের বোধের অগম্য - শেষ দেখা যামিনীভূষণের ভাগ্যে আর হল না। এতদিনকার এত কল্পনা, এত স্বপ্ন সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে - ১৯২৬ সনের ১১ই আগট তিনি ইহধাম থেকে চিরবিদায় নিলেন। ভাগ্য বিরূপ হলেও পরমকারুণিক মঙ্গলময় মঙ্গল ইচ্ছাই মানুষকে সম্মুখপথে এগিয়ে নিয়ে চলে। যামিনীভূষণের আকস্মিক মুত্যুতে সঙ্গীরা মুহ্যমান হয়ে পড়লেও তাঁর আরব্ধ কর্মভার হাতে তুলে নিলেন মহামহোপধ্যায় গণনাথ সেন, মনমোহন পাঁড়ে প্রভৃতি।

একটি সর্বাঙ্গসুন্দর আয়ুর্বেদ হাসপাতাল স্থাপনের উদ্দেশ্যে যামিনীভূষণ তাঁর সবকিছুই দান করে গেছেন - বালিগঞ্জে ১৩ কাঠা জমি, গ্রে স্ট্রীটে ৬ কাঠা, কার্সিয়ং ও রাঁচীর স্বাস্থ্যনিবাস, ১২ বিঘা জমির ওপর পাতিপুকুরের বাগানবাড়ী এবং প্রভুত অর্থ। পাতিপুকুরের এই বাগানবাড়িডেই পরবর্তীকালে স্থাপিত হয় বর্তমান যক্ষ্মা হাসপাতাল।

হাসপাতালের গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ। তদানীন্তন মেয়র দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন করলেন ১৯২৭ সনের জুন মাসে। প্রথমে ৫০টি শয্যা নিয়ে হাসপাতাল খোলা হয় - পরে আরও ২৫টি শয্যা যোগ করা হয়। সকল শয্যাতেই বিনাব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়।

যামিনীভূষণের তিরোধানে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করেন। স্যার আশুতোষের পরলোকগমনে বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভুষণ কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন, পরে অবশ্য স্যার মন্মথনাথ সমগ্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নিযুক্ত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থেকে প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে নিজেকে নিয়োগ করেন। বিদ্যালয়ের সুনাম উত্তরোত্তর প্রসারলাভ করতে থাকে এবং অচিরেই এই বিদ্যালয় আয়ুর্বেদ শিক্ষাডানে শীর্ষস্থান অধিকার করে। কিছুদিন পরেই দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের স্ত্রী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা আনুষ্ঠানিকভাবে হাসপাতালের স্ত্রী বিভাগের উদ্বোধন করেন। হাসপাতালে রোগীসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শীঘ্রই ইহা জনপ্রিয় সেবাপ্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হয়। বর্তমানে ইহার শয্যাসংখ্যা ১২০।

পাতিপুকুর বাগানবাড়ীতে যক্ষ্মা হাসপাতাল স্থাপিত হল। ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় ১৯৩৩ সালে এই যক্ষ্মা হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করেন। বৎসরকাল পরেই মাত্র ১২টি শয্যা নিয়ে যক্ষ্মা হাসপাতালের কাজ শুরু হয়। পরে আরও ২৮টি শয্যা যুক্ত হয় এবং অচিরেই শয্যা সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০। ১৯৫১ সালে স্বর্গীয় অমৃতলাল মজুমদারের আয়ুর্বেআনুকূল্যে তাঁর পরলোকগত পুত্র দেবব্রত মজুমদারের স্মৃত্যর্থে ৬৫,০০০ টাকা ব্যয়ে আরও একটি ত্রিতল ভবন ইহার সহিত যুক্ত করা হয় এবং শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮০ হয়। এই নতুন ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাক্তার হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়। প্রাচ্য পাশ্চাত্য সমন্বয় যুক্ত এই যক্ষ্মা হাসপাতাল থেকে আজ কত শত মুত্যুপথযাত্রী যে নিরাময় হচ্ছেন তাঁর ইয়ত্তা নেই। বর্তমানে এই হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা ৯৪ ।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও হাসপাতাল গরিবের জন্য এ বিশ্বাস লোকের মনে দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে ওঠে - বিদ্যালয়ে ও হাসপাতালে ভিড় ও তাই বাড়তে থাকে। ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি মাননীয় সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের পৌরোহিত্য ১৯৪১ সালের এই বিদ্যালয় ও হাসপাতালের রজত জয়ন্তী

উৎসব আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। এবার স্বর্ণজয়ন্তীর পালা - আর মাত্র দু বছর পরই (১৯৬৬ সন) এই প্রতিষ্ঠান পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করবে। এটা দেশের ও দশেরই গৌরব।

যামিনী ভূষণের স্বপ্ন আজ সার্থক। কিন্তু এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটির আজ বড়ই দুর্দিন। অর্থাভাবই ইহার একমাত্র কারণ। বিরাট বিদ্যালয় ও হাসপাতাল পরিচালনে যে অর্থের দরকার, এ প্রতিষ্ঠানের তা নেই। ব্যয়বহনই আজ প্রধান সমস্যা। বিদ্যালয় ও হাসপাতালের ন্যায় সেবা প্রতিষ্ঠান নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে চলতে পারে না - একে সুষ্ঠুভাবে চালাতে হলে চাই সরকারি সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা। সরকারের সক্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে ইহার পরিচালন ব্যবস্থা নিষ্ফল প্রয়াসমাত্র। যে সেবা পাবে, সে সেবা করবে উদয়াকেই বাঁচতে হবে - তবেই থাকবে সেবা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব। সেবাধর্মী দেশে সেবাব্রতীর অভাব কোনদিনই হয় নি, আজও হবে না। কিন্তু সেবা অর্থ তো আত্মবিলুপ্তি নয়। "বাঁচব এবং বাঁচিয়ে রাখব" - এটাই হল ধর্ম। জাতির মনে আজ এই বোধই জাগ্রত করতে হবে।

পরাধীনতার নাগপাশ মুক্ত হয়ে আজ আমরা স্বাধীন। স্বাধীন সরকারই আজ অগ্রণী হয়ে এত বড় সেবা প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখবেন এই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। আনন্দের কথা, স্বাধীন ভারত সরকার আজ আয়ুর্বেদকে স্বীকার করে নিয়েছেন। আয়ুর্বেদের প্রসারেও তাই সরকার আজ মনোযোগী। রাজ্য সরকারও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই - তাঁরা এগিয়ে এসেছেন স্বহস্তে এই বিদ্যালয় ও হাসপাতালের পরিচালনভার গ্রহণে। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে - দূর দিগন্তে দেখা দিয়েছে নুতন উষার নবারুণচ্ছটা। নতুন আলোকচ্ছটায় সকালের মনে আজ আনন্দের জোয়ার। এতদিনকার স্বপ্ন আজ হবে সফল। জয়গানে আজ সকলেই স্বাগত জানাচ্ছে নুতন পরিচালন ব্যবস্থাকে।

আজ আমরা শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি শিবনাথ সেন, নলিনী রঞ্জন সেন, অমরভূষণ রায়, বিনয় ভূষণ রায় প্রভৃতি স্বর্গতদের - যাঁরা অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করে গেছেন এই প্রতিষ্ঠানকে সরকারি পরিচালনাধীনে আনবার জন্য। এই ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি দেশপূজ্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাসের অবদান অবিস্মরণীয়। শ্যামাপ্রসাদের অকাল মৃত্যুতে

শুধু দেশের ও দশেরই ক্ষতি হয়নি - এই প্রতিষ্ঠানেরও হয় অপুরণীয় ক্ষতি। ট্রাস্টি বোর্ডের ও কার্যকরী সমিতির সভাপতিরূপে তিনি আপদে বিপদে সদাসর্বদা যেন দুই বহু দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে আগলে রেখেছিলেন। প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করেও প্রতিষ্ঠানটি আজও স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। মূলে আছে সেবাধর্মে বিশ্বাসী কর্মীদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা।

প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারী পরিচালনাধীনে আনবার জন্য ইদানীংকালে যারা সচেষ্ট আছেন তাঁদের পুরোভাগে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অর্থমন্ত্রী, এই প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি বোর্ডের ও কার্যকরী সমিতির সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখার্জি। রাজ্য বিধান সভায় সভাপতি থাকাকালীন ১৯৫৬ সালে তিনি সভাপতিরূপে পুনরায় এই প্রতিষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে যোগদান করে এর সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছেন। তিনি যখন এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন তখন প্রতিষ্ঠানের ঘর দুর্দিন। অচিরেই তাঁর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপের দ্বারা ইহা বিপদমুক্ত হয়। তিনি প্রথমেই বুঝেছিলেন যে আয়ুর্বেদের রাষ্ট্রস্বীকৃতি ও সরকারের আনুকূল্য ব্যতিরেকে এত বড় বিরাট প্রতিষ্ঠানকে বর্তমান দিনে বাঁচানে সম্ভব নহে। তাই তিনি প্রথম দিন থেকেই আয়ুর্বেদ বিল প্রণয়ন ও রাষ্ট্র আয়ুর্বেদ কলেজ স্থাপনের জন্য সকল শক্তি নিয়োগ করেন। তাঁরই ঐকান্তিকতায় মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় ও মাননীয় শ্রীপ্রফুল চন্দ্র সেন এবং বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতী পূরবী মুখাজির প্রমুখাৎ সকল স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সক্রিয় সহযোগী করানো সম্ভবপর হয়। এবং ১৯৬১ সালে তদনীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদের সভাপতি, যামিনী ভূষণের একান্ত প্রিয়পাত্র আয়ুর্বেদানুরাগী ডাক্তার অনাথবন্ধু রায়ের নেতৃত্বে বিধানসভা হইতে আয়ুবের্বদ বিল পাশ হইয়া পশ্চিমবঙ্গে আয়ুর্বেদ রাষ্ট্রসীকৃতি লাভ করে। শৈলবাবুর চেষ্টা ও উদ্দমের ফলে আজ সরকার স্বহস্তে ইহার পরিচালন ভার গ্রহণে অগ্রণী হয়েছেন। এ ব্যাপারে শৈলবাবুর অবদান বাংলার গৌরবোজ্জ্বল আয়ুর্বেদের ইতিহাসে তথা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

আয়ুর্বেদকে রাষ্ট্রানুমোদন দানের চেষ্টা পূর্বেই হয়েছিল; কিন্তু সরকার কর্তৃক আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির স্বীকৃতি এই প্রথম। আজ আইন করেই এই চিকিৎসাকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। এই বিদ্যালয় হাসপাতালটি সরকার কর্তৃক স্বহস্ত গ্রহণে দেশের ও দশেরই উপকার। কলিকাতার

সরকারি হাসপাতালসমূহে বর্তমানে রোগীর যে অত্যধিক চাপ তাহাও কিয়ৎ পরিমানে লাঘব হবে। সুষ্ঠু চিকিৎসা ব্যবস্থায় রোগীরা হবে উপকৃত - চিকিৎসক ও কর্মীরা পাবে নুতন প্রেরণা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুলচন্দ্র সেনের কর্মোদ্যমের ও সেবাব্রতী মনোভাবের ওপরে সকলেরই গভীর আস্থা আছে। তাঁর সুযোগ্য পরিচালণাধীনে এই প্রতিষ্ঠাটি অচিরকালের মধ্যেই ভারতে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার অগ্রণী ও আদর্শ আয়ুর্বেদ হাসপাতালে পরিণত হবে, এই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সরকার আজ এগিয়ে এসেছে - সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভ অনিবার্য।

একদা যামিনীভূষণ ধ্বনি তুলেছিলেন "দিন আগত ঐ" - সেদিন আজ এসেছে। মঙ্গলঘট সাজিয়ে সে দিনকে আজ আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। দিচ্ছি জয়ধ্বনি - "সত্যের জয়, নিষ্ঠার জয়!"
যামিনীভূষণের স্বপ্ন আজ সত্যই বাস্তবরূপ নিল।

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

বুধবার
১৪ই আশ্বিন ১৩৭১
শ্রীসূর্য্য কান্ত রায়
শ্রীশঙ্কর প্রসাদ গুপ্ত
সম্পাদকদ্বয়
যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়
জুবিলী কমিটি

## প্রথম কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যগণ ১৯১৯

১। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, সরস্বতী, এম-এ; এল, এম, এস; সভাপতি।

২। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

৩। শ্রীকৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ; সম্পাদক।

৪। কবিরাজ শ্রীযামিনিভুষণ রায়, কবিরত্ন, এম, এ; এম, বি; অধ্যক্ষ।

৫। কবিরাজ শ্রীহেমচন্দ্র সেন, কবিরত্ন।

৬। কবিরাজ শ্রীকালীরঞ্জন সেন, কবিরঞ্জন।

৭। কবিরাজ শ্রীবির্জাচরণ গুপ্ত, কবিভূষণ।

৮। কবিরাজ শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রসন্ন সেন।

৯। ডাঃ শ্রীঅমিয়মাধব মল্লিক এম, বি।

১০। শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র।

১১। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন ( কলিকাতা পৌরসভার প্রতিনিধি )।

## বর্তমান কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যগণ ১৯৬৪

১। শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, সভাপতি।

২। শ্রীপুলিনবিহারী সাউ, সহ-সভাপতি

৩। শ্রীশৈলধর ঘোষ, সহ-সভাপতি

৪। শ্রীলালা হেমন্ত কুমার, সহ-সভাপতি

৫। ডাঃ শ্রীবিমলেন্দু নারায়ণ রায় - যুগ্ম সম্পাদক

৬। কবিরাজ শ্রীশঙ্করপ্রসাদ গুপ্ত - যুগ্ম সম্পাদক

৭। শ্রীসুন্দরলাল দত্ত, কোষাধ্যক্ষ।

৮। কবিরাজ শ্রীপরিমল কুমার সেনগুপ্ত, বিদ্যালয়াধ্যক্ষ।

৯। কবিরাজ শ্রীআনিলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, আরোগ্যশালাধ্যক্ষ

১০। কবিরাজ শ্রীবিনয়ভূষণ রায়, আরোগ্যশালা প্রতিনিধি।

১১। কবিরাজ শ্রীপ্রেমানন্দ কাব্যতীর্থ - বিদ্যালয় প্রতিনিধি।

১২। কবিরাজ শ্রীসুশীলকুমার সেনগুপ্ত, সভাপতি মনোনীত।

১৩। শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়, প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের প্রতিনিধি।

১৪। শ্রীবিশ্বেশ্বর মৈত্র, মনোয়োহন পাণ্ডে পরিবারের প্রতিনিধি।

১৫। ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার, কলিকাতা পৌর সভার প্রতিনিধি।

১৬। শ্রীমোহনলাল ঘোষ

১৭। শ্রীপান্নানলাল দাস

১৮। ডাঃ শ্রীমনীষচন্দ্র প্রধান, সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত।

১৯। শ্রীদুর্গাপদ বাগচী, সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত।

২০। শ্রীগুরপ্রসাদ চক্রবর্তী, সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত।

২১। শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়, সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত।

২২। শ্রীইন্দুভূষণ চৌধুরী, সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত।

২৩। শ্রীব্রজেশ্বর পাণ্ডে, সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত।

২৪। কবিরাজ শ্রীসূর্যকান্ত রায়, সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত।

২৫। কবিরাজ শ্রীব্রাজেশচন্দ্রনাগ, সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত।